সালে যদি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হ'য়ে থাকে এবং ১৭৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে, তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করা হয় তবে তার জন্য দায়ী ছিলেন স্বয়ং ষোড়শ লুই। তাঁর হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা রাজতন্ত্রের পতন ডেকে এনেছিল। রাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের অবিচল আস্থায় তিনিই ফাটল ধরিয়েছিলেন। আসলে ফ্রান্সের মানুষ চেয়েছিল দায়িত্বশীল ও দক্ষ রাজতন্ত্র। পঞ্চদশ লুই বা ষোড়শ লুই যদি ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজাদের মত ফ্রান্সের জনগণের স্বার্থে রাজ্য শাসন করতেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতেন, তাদের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারতেন এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁর ঐ ধরণের করুণ পরিণতি হতো না বলেই মনে হয়। ফ্রান্সের মানুষ স্বৈরতন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাতো না। তা যদি হতো, তাহ'লে বিপ্লবের পরে তারা নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র মেনে নিতো না। ফ্রান্সের রাজারা বুঝতে পারেন নি যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের মানুষেরও চাহিদা বদলাচ্ছিল। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গিয়েছিল সেকেলে। বস্তুতঃ হয়তো একজন বিপ্লবী রাজাই পারতেন ফরাসী বিপ্লব এড়াতে।

২. সমাজ

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের সমাজ তিনটি সম্প্রদায় বা estate এ বিভক্ত ছিল। সেই তিনটি সম্প্রদায় হলো— যাজক, অভিজাত এবং যাজক ও অভিজাত ছাড়া ফ্রান্সের অন্যান্য মানুষ। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক বিন্যাসের বিচারে ফ্রান্সের মানুষ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল— সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং সুবিধাহীন শ্রেণী। এই দিক দিয়ে বিচার করলে একই এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও তীব্র শ্রেণীভেদ ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের সামাজিক কাঠামো প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে এই শ্রেণী সংঘাতের কথা এসে পড়বে এবং আমরা সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা ও ঘৃণার, দম্ভ ও বিদ্বেষের সম্পর্ক ছিল এবং এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপর শ্রেণীর যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল, তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো, কারণ গোড়াতেই বলেছি ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষই বিপ্লবের জন্মদাতা।

ক. যাজক সম্প্রদায় : ফ্রান্সের প্রথম সম্প্রদায় অর্থাৎ যাজকরা ছিল সব চেয়ে বেশি সুবিধাবাদী শ্রেণী। ফ্রান্সের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকেও তাদের অস্তিত্ব ছিল স্বতন্ত্র এবং তারা সযত্নে তাদের সেই স্বাতন্ত্র রক্ষা করতো। আগেই বলেছি রাজার আইন তাদের স্পর্শ করতো না। তাদের উপর কর আরোপ করার কোন অধিকার রাজার ছিল না। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তাদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু যাজকরা ছিল সংখ্যায় খুব অল্প। এদের মোট সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কিছু বেশি (১,৩০,০০০) এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ ছিল যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু ফ্রান্সের মোট জমির এক-দশমাংশ ছিল এদের হাতে। চার্চের আয়ের আর একটি উৎস হলো ধর্মকর বা টাইদ (Tithe) যাজকদের অধিকাংশ ধর্ম চর্চার চেয়ে ঐহিক ভোগ বিলাসে আগ্রহী ছিল। চার্চ ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত।

সামাজিক ও আর্থিক মাপকাঠিতে যাজক মাত্রই সমগোত্রীয় ছিল না। এদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাগ ছিল— উচ্চ যাজক সম্প্রদায় ও নিম্ন যাজক সম্প্রদায়।

Scanned with CamScanner

কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ এবং এ্যাবটরা ছিল উচ্চ যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত। পদ মর্যাদায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা ছিল কুলীন। এদের অনেকেই ছিল উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তান। এরা ছিল যথেষ্ট বিত্তশালী। এদের অনেকের জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। অন্যদিকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক (প্যারিশ) যাজকরা ছিল নিম্ন যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। এদের অনেকেই ছিল দরিদ্র, জীবনযাত্রার মান ছিল নীচু। শিক্ষা দীক্ষাতেও এরা পিছিয়ে ছিল। ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজকদের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান; পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘৃণা, উপেক্ষা ও হিংসার। উচ্চ যাজকরা নিম্ন যাজকদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতো; তাদের মনে করতো গোঁড়া, নোংরা ও অজ্ঞ। বড়লোকরা গরীবদের যে চোখে দেখে, উচ্চ যাজকরা সেই চোখেই দেখতো নিম্ন যাজকদের। অন্যদিকে নিম্ন যাজকরা উচ্চ যাজকদের পদমর্যাদা ও বিত্তকে দেখতো ঈর্ষা ও হিংসার দৃষ্টিতে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও তাই ফরাসী বিপ্লব চলাকালীন যাজকদের দুই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। উচ্চ যাজকরা ছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে। বিপ্লবের ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। কারণ বিপ্লবীদের আক্রমণের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল তারাই। অন্যদিকে নিম্ন যাজক সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে ফ্রান্সের সাধারণ দরিদ্র মানুষের কোন আসমান জমিন ফারাক ছিল না, বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম হ'য়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের মানুষ চার্চ ও যাজকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। চার্চ ছিল পুরাতন্ত্রের জন্মে থাকা গ্লানি ও অবক্ষয়ের প্রতীক। চার্চের জাগতিক জীবনযাত্রা, সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা অষ্টাদশ শতকের যুক্তিশীল মানুষ পছন্দ করে নি। চার্চের আর্থিক দাবী দাওয়া ও অনাচার সাধারণ দরিদ্র মানুষ সমর্থন করে নি। দার্শনিকরা চার্চের দুর্নীতি ও যাজকদের কলুষিত জীবন সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করে চার্চের প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ফাটল ধরান। আমরা দেখব ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম বড় আঘাত পড়েছিল চার্চ ও ধর্ম-যাজকদের উপর।

খ. অভিজাত সম্প্রদায় ঃ যাজকদের মত অভিজাতরাও ছিল সুবিধাবাদী শ্রেণী, যদিও যাজকদের মত তারা পুরোপুরি সুবিধাবাদী ছিল না। যাজকদের মত তারাও ছিল সংখ্যালঘু। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩,৫০,০০০। সাইয়েস (Sieyes) এর মতে এদের সংখ্যা ছিল ১,১০,০০০। এই সংখ্যা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। কারণ তিনি কেবল পরিবারের কর্তাকেই এর মধ্যে ধরেছেন এবং পোষাকী অভিজাতদের ধরেন নি। মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ থেকে ১.৫ শতাংশ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সংখ্যায় যাই হোক, ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় তারাই ছিল শীর্ষে। অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় এক হাজার বছর আগে এবং তাদের উদ্ভবের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব একই সূত্রে গ্রথিত। সামন্ততন্ত্র বলতে বোঝায় এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যাতে জমিকে কেন্দ্র করে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক ধরণের চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দাতাকে বলা হতো প্রভু এবং গ্রহীতাকে বলা হতো প্রজা। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল লেনদেনের, অর্থাৎ দাতা গ্রহীতাকে জমি দিতেন এই শর্তে যে, গ্রহীতা দাতাকে তার বিনিময়ে কিছু সেবা দান করবেন। পারস্পরিক এই সম্পর্ক অবশ্য নিছক দেয়া নেয়ার সম্পর্ক ছিল না। এই সম্পর্কের মধ্যে একটা আন্তরিকতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার দিকও ছিল। অবশ্য কোন

পক্ষ যদি অপরের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করতো, তা'হলে সামন্ততন্ত্রের বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যেত। এক বিশেষ আন্তর্জাতিক প্রয়োজন, যা ছিল অত্যন্ত জরুরী, সামন্ততন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। এই বিশেষ অবস্থা হলো নবম ও দশম শতকে ইউরোপ জুড়ে দুর্ধর্ষ ভাইকিং বা নরম্যানদের অভিযান। তাদের অভিযান, অত্যাচার ও লুটপাটের হাত থেকে ইউরোপকে বাঁচানোর জন্যই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাই সেবা বলতে এখানে মূলতঃ সামরিক সেবাই বোঝাতো। সামন্ততন্ত্রের গঠন ছিল অনেকটা পিরামিডের মত। অর্থাৎ এই ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থানে থাকতেন স্বয়ং রাজা ও সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন সাধারণ কৃষক। এর মাঝে একাধিক স্তর থাকতে পারতো। অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁর অধীনস্থ প্রজা অর্থাৎ সামন্তের সঙ্গে এইভাবে একটি জমি ব্যবস্থা করে নিতেন, ঠিক তেমনই একই ভাবে একজন সামন্ত প্রভুও তাঁর অধীনস্থ একজন সাধারণ কৃষকের সঙ্গে জমিদান ও তার বিনিময়ে কিছু সেবার শর্তে জমি ব্যবস্থা করে নিতেন। ক্রমে ভাইকিং অভিযান শেষ হলেও এবং যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও সামন্ততন্ত্র টিকে গিয়েছিল। সামন্তপ্রভুর সন্তান সন্ততিরা বংশানুক্রমিক-ভাবে তাঁদের জমিজমা উপভোগ করতেন এবং প্রজাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের সেবা আদায় করতেন। এর বিনিময়ে তাঁরা কিন্তু প্রায়শই প্রজাদের কাছে তাঁদের দায় দায়িত্ব পালন করতেন না। অর্থাৎ ক্রমশঃ সামন্ততন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি শিথিল হ'য়ে আসছিল এবং তা এক প্রকার শোষণ ও অত্যাচারের প্রতীকে পরিণত হ'য়েছিল। এই সামন্ত প্রভুরাই ফ্রান্সে অভিজাত সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হতেন। আমাদের এই বর্ণনা থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট। তা হলো অভিজাত সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো বংশ কৌলীন্য। অর্থাৎ যে পরিবার হতো যত প্রাচীন ও বনেদী; অভিজাতের মানদণ্ডে সেই পরিবারই হলো সবচেয়ে খাঁটি অভিজাত। অন্যভাবে বলা যায় তিনিই প্রকৃত অভিজাত সন্তান, যাঁর জন্ম হ'য়েছে অভিজাত পরিবারে বা যাঁর ধমনীতে বইতো নীল রক্ত। অভিজাত পরিবারের সন্তানরা তাই নিজেদের বংশ কৌলীন্য নিয়ে গর্ববোধ করতো। এই ধরণের সাবেকী অভিজাত বংশকে বলা হতো অসিধারী অভিজাত (Nobility of the Sword), বিপ্লবের প্রাক্কালে বংশ কৌলীন্যের গর্বে গর্বিত কয়েক পুরুষের বনেদী অভিজাতের সংখ্যা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। মোট অভিজাতের মধ্যে এরা ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

জন্মসূত্রে অভিজাত পদ পাওয়া গেলেও ফ্রান্সের রাজারা ইচ্ছা করলেই মোটা টাকার বিনিময়ে যে কোন মানুষকে অভিজাত বলে স্বীকৃতি দিতে পারতেন এবং দীর্ঘকাল ধরেই তাঁর এই ক্ষমতা স্বীকৃত ছিল। এই ধরণের আরোপিত বা রাজা কর্তৃক সৃষ্ট অভিজাতদের বলা হতো পোষাকী অভিজাত (Nobility of the Robe)। এদের সংখ্যা কত ছিল বলা মুস্কিল। তবে ১৬০০ সাল থেকে ধরলে পোষাকী অভিজাতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে বিপ্লবের প্রাক্কালে মোট অভিজাতদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ছিল পোষাকী অভিজাত। অষ্টাদশ শতকে পোষাকী অভিজাতের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩২,৫০০ থেকে ৫০,০০০। মোটা টাকার বিনিময়ে ফ্রান্সের উচ্চ বিত্তশালী মানুষ বিভিন্ন সরকারী পদ কিনে নিয়ে এইভাবে পোষাকী অভিজাতের মর্যাদা ভোগ করতেন বলে এঁরা ছিলেন প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের যেমন— বিচার, সামরিক, অর্থ, সাধারণ প্রশাসন ও পৌর বিভাগ ইত্যাদি প্রধান।

Scanned with CamScanner

তাছাড়া রাজা অনেক সময় খুশী হয়েও কোন কোন ব্যক্তিকে পোষাকী অভিজাতের মর্যাদা দিতেন। বলা বাহুল্য পোষাকী অভিজাতরা বংশ পরম্পরায় এই সব সরকারী উচ্চ পদ নিজেদের দখলে রাখতো। এই সব উচ্চ পদাধিকারী অভিজাতদের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে বিচারপতিদের কথা মনে রাখব।

একই সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও অসিকরী অভিজাত ও পোষাকী অভিজাতদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো ছিল না। যে হেতু খাঁটি অভিজাতের প্রধান লক্ষণই ছিল উচ্চবংশে জন্ম, সে হেতু অসিধারী অভিজাতরা পোষাকী অভিজাতদের প্রকৃত অভিজাত বলেই মানতো না। তারা পোষাকী অভিজাতদের সমগোত্রীয় বলে মনে করতো না এবং তাদের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতো। সামাজিক যোগাযোগ, বিবাহ বা আত্মীয়তা এবং অন্যান্য কোন সম্পর্কই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল না। অসিধারী অভিজাতরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। যেমন যে সব পরিবার প্রায় ৪০০ বছরের বনেদী, একমাত্র তাদের সন্তানরাই রাজার সঙ্গে শিকারে যেতে পারতো। মাত্র ৯৪২ টি পরিবার এই মর্যাদার অধিকারী ছিল। এই ধরণের মর্যাদা ছিল তাদের গর্ব ও দম্ভের বিষয়। অভিজাত সম্প্রদায় থেকেই নিযুক্ত হতেন মন্ত্রীরা (ব্যতিক্রম নেকার)। রাজসভার সদস্যরাও ছিলেন অভিজাত। ব্যবসা বাণিজ্য বা কোন প্রকার কায়িক পরিশ্রমকে তারা ঘৃণার চোখে দেখতো। অন্যদিকে পোষাকী অভিজাত বড়াই করতো টাকার। যাদের হাতে দেদার টাকা ছিল, তারাই অভিজাত পদ কিনতো। সুতরাং, তাদের কোন টাকার অভাব ছিল না। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা প্রচুর টাকা রোজগার করতো এবং এ সব কাজ করতে তাদের কোন লজ্জা বা সংকোচ ছিল না। অসিধারী অভিজাতরা এত অলস ছিল যে, অবস্থা খুব খারাপ না হলে তারা এমন কি নিজেদের সম্পত্তিও দেখা শোনা করতো না। বস্তুতঃ আলস্যের জন্যই তাদের আর্থিক অবস্থার অধঃপতন হয়েছিল। আর এইখানেই পোষাকী অভিজাতদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারতো না।

যাজক সম্প্রদায়ের মত অভিজাতদের মধ্যেও বিরোধ, কলহ ও ভেদাভেদ থাকলেও তারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় অনেক সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতো। সাধারণ ভাবে অভিজাত সম্প্রদায় ছিল যথেষ্ট বিত্তশালী। সম্পদের সিংহভাগ ছিল তাদের দখলে। ফ্রান্সের মোট জমির এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশের মালিক ছিল তারা। ভূমি রাজস্ব থেকে যে আয় হতো, তার এক চতুর্থাংশ যেত তাদের পকেটে। তবে অভিজাতদের সবাইকার অবস্থা এক রকম ছিল না। সম্ভবত ২৫০ টি পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ৫০,০০০ লিভ্রর বেশি। এরা ছিল সবচেয়ে ধনী। এদের একটা অংশ ছিল প্রাচীন বনেদী পরিবারের সন্তান। অন্তত এক পঞ্চমাংশ ছিল কর আদায়কারী। অন্যদিকে অভিজাতদের শতকরা ৬০ ভাগের আয় ছিল ৪০০০ লিভ্রর কম; আর কুড়ি শতাংশের আয় ছিল ১০০০ লিভ্রর নীচে। এদের অবস্থা ছিল সম্পন্ন কৃষকদের মত; কিন্তু বুর্জোয়াদের তুলনায় দরিদ্র। এই অবস্থায় ধনী অভিজাত দরিদ্র অভিজাতকে অবজ্ঞা করতো। দিল দরিয়া মেজাজে টাকা খরচ করতো বলে অনেকেই খুব অসুবিধায় পড়তো। কারণ একদিকে এরা যেমন আয় বাড়তে আগ্রহী ছিল না, অন্যদিকে তেমনি জিনিসপত্রের দামও বাড়ছিল। অভিজাত সম্প্রদায় যে সব সুযোগ সুবিধা পেত, সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু সুবিধা ছিল পুরোপুরি সম্মানসূচক, যেমন রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে তরবারি বহনের অধিকার ছিল একমাত্র তাদেরই। দ্বিতীয় ধরণের সুবিধাগুলি ছিল যথেষ্ট লাভজনক। যেমন টেইলি থেকে অব্যাহতি,

বিশেষ বিচারালয়ে বিচারের অধিকার, গ্যাবেল (Gabelle) থেকে অব্যাহতি, রাস্তাঘাট, খাল খনন প্রভৃতি বাধ্যতামূলক শ্রম (Corvee) থেকে ছাড় ইত্যাদি। অভিজাত সম্প্রদায় ছিল খুব দাম্ভিক। তারা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করতো না। শহরের বিত্তশালী বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ বা গ্রামের কৃষক কারও সঙ্গেই তারা সম্পর্ক রাখতো না। এই কারণে ফ্রান্সের ধনী বুর্জোয়ারা যেমন অভিজাত সম্প্রদায়কে পছন্দ করতো না, তেমনই কৃষকরাও তাদের সুনজরে দেখতো না। বিপ্লব চলাকালীন অভিজাত সম্প্রদায় ছিল আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

তবে অভিজাত সম্প্রদায়ের সব কিছুই নিন্দনীয় ছিল না। বুরবোঁ রাজাদের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকে তারাই অনেকটা সংযত করে রাখতো। ফ্রান্সের অর্থনীতিতেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ভারী শিল্পের অনেকটাই ছিল তাদের পুঁজির উপর নির্ভরশীল। এমন কি ব্যাঙ্কিং ও অর্থনীতির উচ্চতর মহলেও ছিল তাদের যথেষ্ট প্রাধান্য। ব্যবসা বাণিজ্য বা হালকা শিল্পে অবশ্য তারা খুব একটা আগ্রহী ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতেও তাদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। শিল্প, সাহিত্য ও ফ্যাসানের দুনিয়ায় তারা ছিল বড় ধরণের পৃষ্ঠপোষক। মন্টেস্কুর (Montesquieu) মত খ্যাতনামা দার্শনিক বা কণ্ডরসেটের (Condorcet) এর মত বুদ্ধিজীবী ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। লাফায়েৎ (Lafayette) এবং মিরাবোর (Mirabeau) ধমনীতে প্রবাহিত হতো অভিজাত রক্ত। সুরুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনের প্রতীক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, এই ধরণের অভিজাতের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। তবু এ কথাও একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠীর সংখ্যালঘু একটি ভাগ বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচার করে বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সামান্য সংখ্যক হলেও কিছু অভিজাত ব্যক্তি (যেমন—মিরাবো) ফরাসী বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছিল।

গ. তৃতীয় সম্প্রদায় : ফ্রান্সে প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ যাজক ও অভিজাতদের যতটা সহজে চিহ্নিত করা যায়, তৃতীয় সম্প্রদায়কে তা করা যায় না। তৃতীয় সম্প্রদায় বলতে কাদের বোঝাতো, তার সরাসরি উত্তর হয় না। সুতরাং ঘুরিয়ে বলি যারা প্রথম ও দ্বিতীয় কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই পড়ে না, তারাই তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। ফ্রান্সের জনসমষ্টির সিংহভাগ, অর্থাৎ প্রায় ৯৬ শতাংশ মানুষ ছিল এই সম্প্রদায়ভুক্ত। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্তরভেদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলেও তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তা বেশি ব্যাপক ছিল। ফ্রান্সের দরিদ্রতম মানুষ থেকে সব চেয়ে বেশি বিত্তশালী এবং সব চেয়ে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর— সব রকম মানুষেরই সহাবস্থান হ'য়েছিল এই সম্প্রদায়ে। ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত 'তৃতীয় সম্প্রদায় কি ?' নামে এক পুস্তিকায় আবে সায়েস (Abby Sieyes) মন্তব্য করেছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায় বলতে সবাইকেই বোঝায়। অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায় একটি সম্পূর্ণ জাতি। তাঁর এই মন্তব্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। যাই হোক্ সাধারণভাবে তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ তিনটি স্তর বা ভাগে বিভক্ত ছিল— বুর্জোয়া, কৃষক ও সাঁ কুলোৎ। আবার এদের মধ্যেও ছিল নানা গোষ্ঠী ও বিভাগ। সুতরাং তৃতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন।

বুর্জোয়া শ্রেণী : বুর্জোয়া (bourgeoisie) কথাটির আক্ষরিক অর্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নাগরিক। কিন্তু মধ্যবিত্ত কথাটি বুর্জোয়ার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার না করে আমরা বুর্জোয়া কথাটিই ব্যবহার করবো এই কারণে যে, বুর্জোয়া

Scanned with CamScanner

কথাটির দ্যোতনা বা অর্থ অনেক বেশি ব্যাপক এবং মধ্যবিত্ত কথাটির মধ্যে তা সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। আমরা বাংলায় মধ্যবিত্ত বলতে যা বুঝি, বুর্জোয়া কথাটি তার ঠিক সমার্থক নয়। যাই হোক তৃতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং অবশ্যই বিত্তশালী, যদিও এদের প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা সমান ছিল না। এরা সংখ্যায় কত ছিল, তা বলা কঠিন। অনুমান করা হয় এদের সংখ্যা ছিল ২,৩০০,০০০। ১৭৮৯ সালে মোট জনসংখ্যার ৮.৪% ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। একটি হিসাব থেকে জানা যায় অষ্টাদশ শতকে এদের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে যে অনুপাতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল, সেই অনুপাতে জাতীয় সম্পদে তাদের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা, তা বলা এক প্রকার অসম্ভব। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বা অনেকটা একচেটিয়া দখল ছিল। কিন্তু শিল্প, ব্যাঙ্কিং বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অন্যান্য স্তরে অভিজাত শ্রেণী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং এই সূত্রে প্রাপ্ত মুনাফায় উভয়েরই ভাগ ছিল।

বুর্জোয়া বলতে কাদের বোঝায় এক কথায় তা বলা মুস্কিল। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, যারা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও অনেকটা তাদের মতই বৈভবের মধ্যে জীবন যাপন করতো, তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতো এবং তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী অনুকরণ করতো, তারাই বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত এবং এদের অধিকাংশই ছিল শহরবাসী। বুর্জোয়া কথাটির মানে নাগরিকও বোঝায়। কিন্তু নাগরিক মাত্রই বুর্জোয়া নয়। শহরের দরিদ্র মানুষকে বুর্জোয়া বলা চলে না। এই সংজ্ঞার মধ্যেও কিন্তু বুর্জোয়াদের পুরো ছবিটা ধরা পড়ে না। আসলে বুর্জোয়ারা অভিজাতও নয়, আবার কৃষক বা মেহনতী মানুষও নয়। আবার বুর্জোয়ারা সবাই সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না, কারণ তাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল। মোটামুটিভাবে তারা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমে বলি উচ্চতর বুর্জোয়াদের কথা। এরা ছিল সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিত্তশালী। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা বা প্রতিপত্তির দিক থেকে এরা অভিজাতদের থেকে পিছিয়ে ছিল। এদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিল ফ্রান্সের অর্থনৈতিক রূপান্তর। ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থকরী পেশা থেকে এদের প্রচুর আয় হতো। এরা ছিল অর্থনৈতিক দুনিয়ার পরিচালক। পুঁজিপতি, সরকারী ঠিকাদার, ব্যাঙ্কার, পরোক্ষকর আদায়কারী বা ফারমার্স জেনারেল (Farmers General) প্রভৃতি বড় বড় ধনকুবের নিয়ে গঠিত ছিল উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণী। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জাহাজের মালিকও এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। তবে এরা সংখ্যায় অধিক হলেও এদের প্রভাব কম ছিল। অনেক সময় সরকার বড় বড় ব্যবসাদারদের লাইসেন্স ও ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার দান করে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সরকারও অনেক সময় এদের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তবে ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যারা আমেরিকা মহাদেশ বা ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করতো, সরকারী নীতিতে সব সময়ে খুশী ছিল না। ফরাসী রাজতন্ত্রের দায়িত্বহীন বৈদেশিক নীতির ফলে ভারত ও কানাডায় তাদের ব্যবসার খুব ক্ষতি হওয়ায় তারা সরকারের উপর আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। দেশের অভ্যন্তরেও ব্যবসাদাররা নানাভাবে অভিজাতদের হাতে হেনস্থা হতো। এর কোন প্রতিকারও ছিল না, কারণ পার্লম বা আদালতগুলির রায় সব সময়েই যেত অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে। অগেই বলেছি পার্লমর বিচারপতিরা সবাই ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। সরকারের ত্রুটিপূর্ণ শুল্কনীতি এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী নীতি ও

বিরোধিতার জন্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এর জন্যও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সরকারের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। ১৭৮৮ সালে আর্থার ইয়ং (Arthur Young) ফ্রান্স পরিভ্রমণ কালে বন্দর শহর নান্টেস (Nantes) অধিবাসীদের বৈপ্লবিক মানসিকতা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যেমন বহিঃবাণিজ্যের ফলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল, ফ্রান্সের সরকারী ঠিকাদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীও চতুর্দশ লুই-এর আমলে ব্যয়বহুল যুদ্ধে সেনাবাহিনীর রসদ যোগান দিয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিল। এইভাবে যারা ব্যবসা করেই হোক বা অন্য কোন পথেই হোক প্রচুর টাকা রোজকার করতো, সরকারের নীতি ছিল তাদের প্রশাসনের অঙ্গীভূত করা। চতুর্দশ লুইয়ের বিখ্যাত মন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) ছিলেন রাইমস্-এর (Rheims) একজন ব্যবসায়ীর পুত্র। লক্ষ্য করার বিষয় অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্বেষ থাকলেও উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষই মোটা টাকার বিনিময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের মর্যাদা কিনতো। আসলে এরা অভিজাতদের জীবনযাত্রা প্রণালী অনুকরণ করতো। অনেকেরই লক্ষ্য থাকতো ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে অভিজাত পদ কেনা। তারপর অনেকে সেই টাকা জমিতেও লগ্নী করতো বা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করে অভিজাত পরিবারের মত জীবন যাপন করতো। ঐতিহাসিক জোরেস্ (Jaures) দাবী করেছেন যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে প্যারিসের দ্রুত পুনর্গঠনে এদের অবদান ছিল অভিজাতদের তুলনায় অনেক বেশি। ফ্রান্সের উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীকেও সুবিধাবাদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পৌর সনদের ফলে সামন্ততান্ত্রিক বিভিন্ন দায় দায়িত্ব থেকে তারা অব্যাহতি পেত। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সরকারী কর থেকেও ছাড় পেত। যেমন অর্লিয়ঁর (Orleans) অধিবাসীদের টেইলি দিতে হতো না। সামরিক দায় দায়িত্ব থেকেও তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। অর্লিয় ছাড়া প্যারিস্ (Paris), টুরস্, (Tours), বোর্দো (Bordeaux) প্রভৃতি শহরের অধিবাসীরাও টেইলি দিত না। একদিক থেকে দেখতে গেলে ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চ বুর্জোয়াদের মধ্যে খুব একটা তফাৎ ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ হলো এই যে, অভিজাতদের সেটা খুব গর্বের বিষয়, উচ্চ বুর্জোয়াদের সেই বংশকৌলিন্য ছিল না। ছিল না তাদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি। সুতরাং সব কিছু থেকেও তারা ছিল নিঃস্ব। অভিজাতদের সমকক্ষ না হলেও বিপ্লবের ফলে উচ্চ বুর্জোয়ারাও অভিজাতদের মত যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছিল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ মধ্যবর্তী বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়া স্তরে ছিল মূলতঃ পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের মধ্যে পড়তো সরকারী কর্মচারী, আইনজীবী, কিছু সংখ্যক ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি। এদের অর্থকৌলিন্য ছিল না। উচ্চ বুর্জোয়াদের তুলনায় এরা অনেক দরিদ্র ছিল। সুতরাং উচ্চ বুর্জোয়ারা এদের স্বজাতীয় বলে মনে করতো না। কিন্তু উচ্চ বুর্জোয়ারা যদি বিত্ত বা সম্পত্তির গর্ব করতো, তাহলে এদের গর্বের বিষয় ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। উচ্চ বুর্জোয়াদের তার যথেষ্ট অভাব ছিল বলে এরা আবার তাদের সমগোত্রীয় বলে মনে করতো না। ফলে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। যাই হোক শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই দার্শনিকদের বৈপ্লবিক মতাদর্শ নিয়ে মাতামাতি করতো এবং এই ভাবে তারা বিপ্লবের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী,

Scanned with CamScanner

নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ কিছুটা নিজেদের নিয়ে থাকতেই ভালবাসতো। এদের অনেকেই ছিল দরিদ্র এবং জাগতিক সুখ সাচ্ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামাতো না।.নৈতিক চরিত্রও সবার ভাল ছিল না।

বুর্জোয়া শ্রেণীর তৃতীয় স্তরে যারা ছিল তাদের আমরা নিম্ন বুর্জোয়া বলতে পারি। আর্থিক সাচ্ছল্য বা বিদ্যাবুদ্ধি কোন দিক থেকেই তারা খুব একটা অগ্রসর ছিল না। এদের অনেকেই কায়িক পরিশ্রম করে দিন চালাতো। এদের কিন্তু দরিদ্রও বলা চলে না। যাই হোক এরা কায়িক পরিশ্রমক করতো বলে যারা নিজেদের খাঁটি বুর্জোয়া বলে মনে করতো, তারা এদের স্বজাতি বলে মনে করতো না। ছোট খাটো ব্যবসাদার, দোকানদার, মুদ্রাকর, পুস্তক বিক্রেতা, ঠিকাদার প্রভৃতি স্তরের মানুষকে এই দলে ফেলা যায়।

সামগ্রিক বিচারে আমরা দেখলাম শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। তাদের এই ক্ষোভ মূলতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হলেও সরকারের উপরও তারা অসন্তুষ্ট ছিল। কেবলমাত্র জন্ম সূত্রে তারা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল বলে এবং অর্থ, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতা কোন দিক থেকেই তারা অভিজাতদের থেকে পিছিয়ে না থাকলেও তারা যে অভিজাতদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, এটাই ছিল তাদের ক্ষোভের প্রধান কারণ। অন্যদিকে সরকার যে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন ছিল, তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে খুব একটা উৎসাহ দিত না বা পৃষ্ঠপোষকতা করতো না, এ জন্য তারা সরকারের উপরও অসন্তুষ্ট ছিল। তারা অবশ্য সরকারকে আপদে বিপদে আর্থিক সাহায্য দিত। কিন্তু তার জন্য তারা মোটা টাকার সুদ পেত। এই কারণে আবার তারা সরকারের কাছে কিছুটা কৃতজ্ঞও ছিল। কিন্তু যখন সরকারের দুর্দিন ঘনিয়ে এল এবং সরকারের পক্ষে আর্থিক দায় দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়লো, তখন সরকারের প্রতি তাদের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে একটা সময় ছিল,যখন মোটা টাকার বিনিময়ে অভিজাত পদ কেনা সম্ভব ছিল। কিন্তু পরে যখন সে সুযোগও অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তখন রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র উভয়ের প্রতিই তাদের মোহ ফুরিয়ে গেল। তাদের কাছে এই রাষ্ট্র সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজন রইল না। আসলে বুর্জোয়ারা শুধু সামাজিক মর্যাদাই চায় নি ; যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে অক্ষম তারও পরিবর্তন চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তারা প্রচার করেছিল সাম্যের আদর্শ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার অভাব ছিল। অন্যদের থেকে তারা নিজেদের পৃথক বলে মনে করলেও তারা কোন সামাজিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা না করে বা সংঘর্ষের পথ না ধরে অভিজাত হবারই চেষ্টা করতো। বস্তুতঃ অভিজাত ও বুর্জোয়ারা অনেক সময়েই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করতো। এমন কি বিপ্লবের ঠিক প্রাক্‌কালেও বুর্জোয়ারা অভিজাতদের বিপক্ষে যায় নি ; বরং ১৭৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭৮৮ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায় যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তখন বুর্জোয়ারা তাদের সমর্থন করেছিল। অভিজাতদের মত তারাও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ১৭৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বুর্জোয়ারা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। এর পরই উভয়েই মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হ'য়ে পড়ে।

কৃষক সম্প্রদায় ঃ ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষক (মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ)। এরা ছিল অত্যাচারিত, শোষিত ও বঞ্চিত। আর্থিক অবস্থা সবার সমান না হলেও এরা ছিল দরিদ্র। যাজক, অভিজাত, বুর্জোয়া— কারও সঙ্গেই এদের কোন একাত্মতা ছিল না। এদের না ছিল সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, না ছিল কোন রাজনৈতিক অধিকার। এদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। করের বোঝা ছিল এদেরই উপরই সবচেয়ে বেশি। আবার সামন্ত প্রথার সমস্ত দায় দায়িত্ব তারাই বহন করতো। বিনিময়ে সামন্ত প্রভুরা তাদের কর্তব্য পালন করতো না। রাষ্ট্রও ছিল অনেকাংশে নির্বিকার। সাধারণভাবে মনে করা হতো কৃষকদের জন্মই হ'য়েছিল উপরতলার মানুষকে সেবা করার জন্য— (শহরবাসীর অন্ন যোগান দেয়া আর রাষ্ট্রকে কর দেয়াই তাদের কাজ।)

কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ ও সামাজিক দায় দায়িত্ব কতটা দুর্বিসহ ছিল, তা একটু বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা করলেই স্পষ্ট হবে। তারা চার্চকে দিত টাইদ (Tithe); রাজকে দিত সব রকম কর— টেইলি (Taille), ক্যাপিটেশন (Capitaion), ভিংটিয়েমে (Vingtiemes)। টেইলির প্রায় সবটাই আদায় করা হতো কৃষকদের কাছ থেকেই। অথচ তারা ছিল খুবই দরিদ্র। রাজাকে দেয় করের মধ্যে যেটা তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর বলে মনে হতো, তা হলো গ্যাবেল (Gabelle) বা লবণকর এবং এইডস্ (Aides) বা তামাক, মদ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর উপর ধার্য কর। তাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণে তারা করতো বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমদান বা কর্ভি— (Corvee)। সামন্ত প্রথার বিভিন্ন বাধ্যতামূলক সেবা বা দায়দায়িত্ব নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছিল। সামন্ত প্রভুরা কৃষকদের উপর যে সব অধিকার ফলাতো, তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কিছু অধিকার ছিল পুরোপুরি সম্মানসূচক— যেমন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সামন্ত প্রভুর অগ্রাধিকার বা বিশেষ সম্মান, ম্যানর হাউসের মাথায় পায়রার খোপ তৈরী করা বা কোন দিকে বাতাস বইছে তা নির্ধারণ করার জন্য যন্ত্র বসানো ইত্যাদি। এগুলি ছিল সামন্ত প্রভুদের শক্তি ও ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ বা প্রতীক। বিপ্লব চলাকালীন কৃষকরা যেভাবে এগুলির উপর আক্রমণ করেছিল, তা থেকে তাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরে ছিল কিছু আইনগত অধিকার। গ্রামে স্থানীয় বিচারের জন্য যে বিচার সভা ছিল, তার বিচারপতিরা ছিলেন সামন্ত প্রভুদের অধীন। সুতরাং সেখানে সুবিচারের কোন আশা ছিল না।(সব শেষে ছিল কিছু তথাকথিত সুবিধাজনক ও লাভজনক অধিকার।)এদের মধ্যে পড়বে শিকার বা মৃগয়ার অধিকার, বাধ্যতামূলক শ্রমদান বা কর্ভি (Corvee) ইত্যাদি। এ ছাড়া নানা ধরণের পাওনাগণ্ডাও আদায় করতো সামন্ত প্রভুরা— যেমন উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের বিনিময়ে সামন্তপ্রভুর কলে গম বা যব ভাঙার অথবা মদ্য প্রস্তুতের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। একে বলা হতো বানালিতে (Banalite)। অন্যান্য করের মধ্যে ছিল সেন্স (Cens) বা এক ধরণের বাৎসরিক খাজনা, সামন্তপ্রভুর প্রাপ্য ফসলের এক অংশ যাকে বলা হতো স্যামপার্ট (Champart) এবং লৎ এৎ ভেন্তি (Lods et Ventis)বা সম্পত্তি হস্তান্তরজনিত কর। চার্চ, রাষ্ট্র ও সামন্ত প্রভুদের এই সব দায় দায়িত্ব মিটিয়ে কৃষকদের

Scanned with CamScanner

হাতে বলতে গেলে কিছুই থাকতো না। ফ্রান্সের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে আর্থার ইয়ং মন্তব্য করেছিলেন যে, ফরাসী কৃষকের আয়ের শতকরা আশি ভাগই ব্যয়িত হতো এই সব দাবী মেটাতে। মুদ্রাস্ফীতির সময় এই সব গুরুভার আরও দুর্বহ বলে মনে হতো।

ফ্রান্সের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত কৃষকদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল এবং সবাইকার অবস্থা এক রকম ছিল না। এমন কি সামন্ত প্রথাজনিত দাবী দাওয়ার চাপও সব জায়গায় এক রকম ছিল না। যাই হোক ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কৃষকদের মধ্যে একটি ছোট গোষ্ঠী ছিল, যাদের সম্পন্ন কৃষক বা জোতদার বলা যেতে পারে। যে সমস্ত বিত্তশালী ধনী ব্যক্তি গ্রামে বসবাস না করে শহরে বাস করতো, এরা তাদের জমি ইজারায় গ্রহণ করে চাষবাস করতো অথবা কাউকে দিয়ে চাষ করাতো। এদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিল না, ৬ লক্ষের কিছু বেশি। কিন্তু স্থানীয় এলাকায় এদের খুব প্রতিপত্তি ছিল, বিশেষতঃ যদি অভিজাত জমিদার বা বুর্জোয়া ভূম্যধিকারী বছরের পর বছর গ্রামে না আসতেন। দ্বিতীয় স্তরে ছিল সেই সব কৃষক যাদের যথেষ্ট পরিমাণ জমিজমা ছিল এবং এ থেকে যা ফসল উৎপন্ন হতো, তাতে তাদের সারা বছর ভালভাবে চলে যেত; এমন কি ভগবান মুখ তুলে চাইলে বা কোন বছর ফসল ভাল হলে, বাজারে বিক্রী করার মত কিছু উদ্বৃত্ত তাদের হাতে থাকতো। এই ধরণের ধনী গৃহস্থ কৃষকের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। এদের বলা হতো লেবোরার (Laboureurs)। এদের এই সচ্ছলতার জন্য গ্রামের অন্যান্য কৃষকেরা তাদের কিছুটা সম্ভ্রম ও সম্মান এবং একই সঙ্গে কিছুটা হিংসার দৃষ্টিতে দেখতো। খাদ্যাভাব দেখা দিলেও বা জিনিস পত্রের দাম বাড়লেও এরা কিছুটা সামলে নিতে পারতো। এই দুই শ্রেণীর সম্পন্ন কৃষকদের বাদ দিলে, ফ্রান্সের অধিকাংশ কৃষকের অবস্থাই ছিল খুব খারাপ। ফ্রান্সের অনেক কৃষকেরই নিজস্ব জায়গা জমি ছিল। কিন্তু তাতে যে ফসল উৎপন্ন হতো, তা দিয়ে সারা বছরের আহার জুটতো না। অনেকেরই আবার নিজস্ব জমিজমা এবং উৎপাদন সামগ্রীও ছিল না। যারা নিজস্ব জমিজমা থাকলেও সংসার চালাতে পারতো না, তারা চাষবাস ছাড়া কখনও কাপড় বুনে, কখনও ছোট খাট জিনিসপত্র তৈরী করে আবার কখনও বা মজুরের কাজ করে কিছু টাকা রোজগার করার চেষ্টা করতো। অনেক সময়েই তারা হাত পাততো মহাজনের কাছে। আর যখন কোন উপায়ই থাকতো না, তখন তারা করতো ভিক্ষাবৃত্তি। যাদের জমিজমা ছিল না, তারা পরের জমিতে ভাগে চাষ করতো। ফ্রান্সে এদের বলা হতো মেতায়ের (Metayers)। ফ্রান্সের কৃষকদের অর্ধেক বা তার বেশি ছিল এই সব ভাগচাষী বা বর্গাদার। জমির মালিকের সঙ্গে উৎপন্ন ফসলের আধাআধি বখরা হতো। এদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। এছাড়া ছিল ভূমিহীন কৃষক যাদের অনেকেই ছিল ভিখারী, ভবঘুরে এবং এমন কি ছোটখাটো অপরাধী। জমি না থাকায় জমির প্রতি তাদের কোন টানও ছিল না। ফ্রান্সের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল পঁচিশ শতাংশ। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সাধারণ কৃষকের যেমন অসুবিধা হ'য়েছিল তেমনই ভূমিহীন কৃষকরাও সমস্যায় পড়েছিল। সাধারণ কৃষকদের অসুবিধায় পড়ার কারণ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জমির আয়তন বা পরিমাণ বাড়ে

নি। ফলে জমির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হ'য়েছিল ভূমিহীন কৃষকদের। অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; আবার অনেকে রুটির জন্য শহরে ভিড় করে। আসলে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও কৃষি শ্রমিকদের মজুরি সমানুপাতিক হারে বাড়েনি। ফলে তাদের কষ্টের অবধি ছিল না। কৃষকদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ভূমিদাস কৃষক বা সার্ফ (serf)। এদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিল না— শতকরা মাত্র পাঁচজন। একটি সূত্রে জানা যায় বিপ্লবের ঠিক আগে ফ্রান্সে দশ লাখের মত ভূমিদাস ছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্সে ভূমিদাসদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে পারতো। কিন্তু কাগজে কলমে স্বাধীন হলেও তাদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

সামাগ্রিকভাবে ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায় ছিল অশিক্ষিত ও রক্ষণশীল। সরকার কৃষি উন্নয়ণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নিলে তারা তার তীব্র বিরোধিতা করতো। ফলে জনসংখ্যা বাড়লেও কৃষি উৎপাদন সমানুপাতিক হারে বাড়েনি। আসলে দরিদ্র কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজন ও ব্যবহারের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতো। উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন তাদের লক্ষ্য ছিল না।

সাঁ কুলোৎ (Sans-cueottes) : শহরের মেহনতী মানুষ সাঁ কুলোৎ (Sans-cueottes) নামে পরিচিত ছিল। সাঁকুলোৎ কথাটির আভিধানিক অর্থ হলো-যারা অন্তর্বাস পরে না। শহরের নিচুতলার এই সব মানুষ ছিল দরিদ্র। এদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। সামান্য যাদের অক্ষর পরিচয় ছিল, তারাও লেখাপড়ার ধার ধারতো না। মেহনতী এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল দিন মজুর, কারখানার শ্রমিক, কারিগর, শিক্ষানবিসী, মুটে, বাগানের মালি, জলের ভিস্তি বাহক, কাঠুরে, রাজিমিস্ত্রী, জেলে, গৃহভৃত্য প্রভৃতি সাধারণ মানুষ, যাদের প্রধান যোগ্যতা ছিল গা-গতরে খাটার ক্ষমতা। প্যারিস শহরের অধিকাংশ মানুষই ছিল সাঁ-কুলোৎ। ১৭৮৯ সালে এই শহরে ছ লাখ থেকে সাড়ে-ছ লাখ লোকের বাস ছিল, যার মধ্যে অভিজাত, যাজক ও বুর্জোয়াদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,০০০, ১০,০০০, এবং ১,০৫,০০০। বাকি সবাই ছিল নিচুতলার মানুষ। শহরবাসী এই গরীব মানুষের একটা বড় অংশই আসতো গ্রাম থেকে। এরা শহরের নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতো। যখন এদের হাতে কাজ থাকতো না, তখন অনেকেই হয় ভিক্ষা করতো, নয় অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকতো। এদের ঘরের মেয়েরা করতো দেহ বিক্রয়। ছোট খাটো গণ্ডগোল বাধাতে এই সব মানুষ ছিল ওস্তাদ এবং অনেক সময় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদরা এদের ব্যবহার করতো নিজেদের প্রয়োজনে। শহরের ধনী ও সম্ভ্রান্ত মানুষ এদের ঘৃণা করতো এবং মনে করতো শহরের সমস্ত অশান্তির জন্য এরাই দায়ী। খেটে খাওয়া এই সব মানুষও ধনীদের দেখতো সন্দেহের দৃষ্টিতে। ধনীদের বিলাসবহুল জীবন তাদের হিংসার উদ্রেক করতো। এদের মজুরি ছিল কম। এদিকে জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছিল। কিন্তু পাল্লা দিয়ে এদের বেতন বাড়তো না। ১৭৩০ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে দানা শস্যের দাম বেড়েছিল ৬০ শতাংশ; কিন্তু ঐ সময়ে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২২ শতাংশ। এই

Scanned with CamScanner

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ছিল এদের সব চেয়ে বড় অভিযোগ। এ নিয়ে মাঝে মাঝে অশান্তিও হতো। প্রায়ই এই সব খাদ্য গুদামায় নেতৃত্ব দিত মেয়েরা। ব্যবসায়ীরা আক্রান্ত হতো ও সস্তায় খাদ্য শস্য বিক্রী করতে তাদের বাধ্য করা হতো। শ্রম অসন্তোষ অনেক সময় ধর্মঘটের রূপ নিতো। তবে তারা মজুরী বৃদ্ধির কথা বলতো না; তাদের দাবী ছিল দ্রব্যমূল্য হ্রাস। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে সাধারণ মানুষ ধর্মঘটের চেয়ে দাঙ্গা গুদামকে অনেক বেশি জোরালো হাতিয়ার বলে মনে করতো।

* * *

তিনটি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত ফ্রান্সের সমাজ কাঠামোর যে বিশ্লেষণ আমরা করলাম, তা থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ প্রাক্ বিপ্লব যুগে ফ্রান্সে উচ্চতর যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল। কিন্তু এই অসন্তোষের চেহারা বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দাবী এক ধরণের ছিল না। বুর্জোয়াদের ক্ষোভ ও দাবীর সঙ্গে কৃষক ও সাঁ কুলোৎদের ক্ষোভ ও দাবীর বিস্তর ফারাক ছিল। এমন কি নিম্নবর্গের মধ্যেও কৃষক ও সাঁ কুলোৎদের ক্ষোভ ও চাহিদা এক রকম ছিল না। অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিচারে বুর্জোয়ারা ছিল যথেষ্ট বিত্তশালী। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা করের বোঝা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতো না। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে অনেকটা বঞ্চিত ছিল বলে তারা পুরাতনতন্ত্র পছন্দ করতো না। তবে পয়সা দিয়ে অভিজাত মর্যাদা কিনতে পারা যেত বলে তাদের চাহিদা মেটাবার একটা পথ খোলা ছিল। কৃষকরা বা সাঁ কুলোৎরা সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রত্যাশী ছিল না। কৃষকদের কাছে করের বোঝা ও সামন্ত প্রথাজনিত অত্যাচারের প্রতিকার ছিল সবচেয়ে বেশি জরুরী। দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়া ও কৃষক উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কারণে অভিজাত শ্রেণীর উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আবার সাঁ কুলোৎরা শহরবাসী ছিল বলে অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের মূল দাবী ছিল একটি — তা হলো সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ। তবে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই যাজক সম্প্রদায়ের উপর রাগ ছিল। কিন্তু ক্ষোভের আকৃতি যাই হোক, তা প্রতিকারের জন্য এবং নিজ নিজ আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য প্রত্যেকেই রাজার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। দুঃখের বিষয় রাজা এ ক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'য়েছিলেন। রাজা যদি এদের ক্ষোভের প্রতিকার করতে পারতেন, তাহ'লে ফ্রান্সের মানুষ তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো। অর্থাৎ রাজা যদি কোন বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করতেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা কার্যকরী করতে পারতেন, তা হ'লে হয়ত বিপ্লবের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত। একমাত্র রাজাই পারতেন বিপ্লবকে এড়াতে, কারণ ফ্রান্সের মানুষ তখনও রাজতন্ত্রে আস্থাশীল ছিল। রাজাকে তারা ভক্তি শ্রদ্ধা করতো।

দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের সমাজ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকলেও এই বিভাগ অনেকাংশে কৃত্রিম ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য ছিল। তাই নিম্ন যাজকরা প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাদের সঙ্গে ফ্রান্সের নিম্নবর্গের মানুষের আত্মিক মিল ছিল। তাদের সামাজিক অবস্থান উচ্চতর যাজকদের চেয়ে এদের অনেক কাছাকাছি ছিল। বিপ্লব চলার

সময় আমরা দেখব নিম্ন যাজক সম্প্রদায় উচ্চতর যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে না থেকে একের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল। আবার একদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বুর্জোয়াদের ছিল আঁত নকুলের সম্পর্ক এবং ফরাসী বিপ্লবকে মূলতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী সংঘাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই ধরণের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। অভিজাতদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের সামাজিক ব্যবধান দুস্তিক্রম্য বা অনতিক্রম্য ছিল না। আমরা দেখেছি বুর্জোয়ারা অভিজাত পদের জন্য লোলুপ ছিল এবং পয়সা দিয়ে তা কিনেও নিত। আবার অভিজাতরাও সব সময় বুর্জোয়াদের নিজস্ব বৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যকে ঘৃণার চোখে দেখতো না। তারা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ নিত এবং বুর্জোয়াদের চেয়ে তাদের হাতেই বাণিজ্যিক পুঁজি বেশি সঞ্চিত হয়েছিল। অন্যদিকে জমি জমার দিকে বুর্জোয়াদের যথেষ্ট টান ছিল। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র শ্রেণী সংঘাত ছিল না। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু বিপ্লবের সময়েও উভয়ের মধ্যে কখনও কখনও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। জাতীয় সভার নেতারা ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু এমনও অবশ্য ঘটেছে যে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য বুর্জোয়ারা অনারোষ অভিজাতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল। সার্বিকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ঘটেছিল। তবু বুর্জোয়াদের সবাই অভিজাতদের পক্ষে ছিল বলে মনে হয় না। আমরা আগেই দেখেছি যে, তাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল।

৩. অর্থনীতি

অষ্টাদশ শতকের মানদণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় ফ্রান্সকে কোন ক্রমেই অনুন্নত দেশ বলা চলে না। তবে অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অগ্রসর দেশ ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ফ্রান্স অনেক পিছিয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতকের অনেক আগেই ইংল্যাণ্ডে কৃষি বিপ্লব ও বাণিজ্যিক বিপ্লব ঘটেছিল। এই শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবও শুরু হয়ে যায়। ফ্রান্সে এই ধরণের কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে নি। ১৭১৫ সালে ফ্রান্সের অর্থনীতি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ১৭৮৯ সালে মোটামুটি সেখানেই স্থিতিশীল ছিল। তবু ফ্রান্সের স্থান ছিল ইংল্যাণ্ডের পরেই।

ফ্রান্সে অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। ফ্রান্সের জনসমষ্টির শতকরা আশি ভাগই ছিল কৃষক। কিন্তু ফ্রান্সে কৃষি ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। বস্তুতঃ ফ্রান্সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য উৎপাদন খুব ধীর গতিতে বেড়েছিল। ফ্রান্স ছিল ইউরোপে সব চেয়ে জনবহুল দেশ। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে জনসংখ্যা স্থিতিশীল ছিল। সম্ভবতঃ তা হ্রাস পেয়েছিল। ১৭১৫ সালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কিংবা ১৭ মিলিয়ন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তা আনুমানিক ২২ মিলিয়ান এসে দাঁড়ায় এবং বিপ্লবের সময় এই সংখ্যা ছিল সম্ভবতঃ ২৬ মিলিয়ান। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ফ্রান্সে কৃষি ব্যবস্থা ছিল চিরাচরিত এবং সেখানে কোন কৃষি বিপ্লব ঘটে নি। উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় নি। তবু উৎপাদন যেটুকু বেড়েছিল অনাবাদী জমিতে ফসল ফলানোর জন্যই তা ঘটেছিল। কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন বাড়ে নি। তবে এই অবস্থার জন্য সরকার পুরোপুরি দায়ী ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষির উন্নতির জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'য়েছিল। কৃষকদের উৎসাহিত করার

Scanned with CamScanner

জন্য সরকারী কৃষি সংস্থা তাদের নানা ধরনের উপদেশ দিত। নানা শস্য ছাড়াও আলু, ভুট্টা প্রভৃতি নতুন নতুন শস্য উৎপাদনের উপর জোর দেয়া হয়। কৃষিকার্যে সাফল্যের পশুদের অধিকতর বৃদ্ধির দিকেও নজর দেয়া হয়। আসলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকেই ফ্রান্সে কৃষির উন্নতির জন্য সর্বস্তরে একটি সাড়া পড়ে যায়। অনেকেই ফ্রান্সে কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন ফ্রান্সের এক দল অর্থনীতিবিদ, যাঁদের বলা হয় 'ফিজিওক্র্যাট্' (Physiocrats)। তাঁরা এই ধারণা রাখেন যে, অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে ঘন ঘন খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র যে অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ঘটেছিল, তা নয়; আসলে কৃষকদের সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গী এর জন্য দায়ী ছিল। তারা তাদের উদ্বৃত্ত শস্যাদি খাদ্যে ঘাটতি এলাকায় বিক্রয় করতেও অনিচ্ছুক ছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাঁরা খাদ্যশস্যের দীর্ঘ মেয়াদী মূল্যবৃদ্ধিও সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সনাতনপন্থী কৃষকদের তা আকৃষ্ট করতে পারে নি। তারা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনে আগ্রহী ছিল না। অর্থনীতিবিদরা ইংল্যান্ডের মত ফ্রান্সেও কৃষি জমি ঘেরাও (enclosure) করার নীতির পক্ষপাতী হলেও কৃষকরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এর কারণ পুঁজির অভাব; আবার গ্রামের যে সব পতিত জমি গ্রামবাসী যৌথভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ভোগ করতো, অর্থনীতিবিদগণ সেগুলি ভাগ করে দেবার জন্য অভিমত প্রকাশ করলেও কৃষকেরা তাতে আগ্রহী হয় নি। তাদের ভয় হয়েছিল এর ফলে তাদের যৌথ অধিকারের অবসান ঘটবে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে জেথরো টুল (Jethro Tull) কৃষির উন্নতির জন্য যে নতুন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, তাও ফ্রান্সে অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল। কয়েকজন প্রভাবশালী অভিজাত কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের কৃষক কঠোর, পরিশ্রমী, অনুগত ও নম্র স্বভাবের হ'লেও রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। সরকারের প্রগতিশীল সংস্কারগুলির তাৎপর্য বোঝবার মত মানসিকতা তাদের ছিল না। অষ্টাদশ শতকে কৃষকেরা তাদের চিরাচরিত উৎপাদন পদ্ধতি ও যৌথ অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের প্রগতিশীল পরিকল্পনাগুলির বিরোধিতা করতো। তাই কৃষির উন্নতির জন্য সরকার বার্তিনের (Bertin) নেতৃত্বে একটি বিশেষ কৃষি কমিটি গঠন করলেও বা সারা রাজ্য জুড়ে অগণিত কৃষি সমিতি গড়ে তুললেও এবং এমনকি পতিত জমি ঘেরাও করার জন্য সরকারী নির্দেশ জারী করা সত্ত্বেও তা শেষপর্যন্ত কোন কাজে লাগে নি। আসলে ফ্রান্সের জমির শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ কৃষকদের হাতে থাকলেও তারা এত দরিদ্র ছিল যে, অন্যদিকে নজর দেবার মত সুযোগ তাদের ছিল না। তাদের যৌথ অধিকারগুলি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইজন্য তারা ব্যাকুল ছিল। সরকারের প্রগতিশীল পরিকল্পনাগুলি বড় জমিদারদের পক্ষে লাভজনক হলেও সাধারণ দরিদ্র কৃষদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সরকারের প্রগতিশীল পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার জন্য কেবলমাত্র কৃষকরাই দায়ী ছিল না। সামন্ত প্রভুরাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। জমি ঘেরাও নীতির ফলে তাদের সামন্ততান্ত্রিক সুবিধাগুলিও আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে তাদের মৃগয়া বা শিকারের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে ১৭৭৫-৮০ সালের অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা প্রগতিশীল সংস্কারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব ছিল। তবু সরকারী প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'য়েছিল, সে কথা মনে করারও কোন কারণ নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে ছোট ছোট ক্ষেতগুলিকে একত্র করে বড় খামারে পরিণত করা হ'য়েছিল এবং ঘেরাও নীতি গ্রহণ করা হ'য়েছিল।

কৃষকদের রক্ষণশীল মনোভাব ছাড়া আরও একটি কারণেও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হ'য়েছিল। সেটি হ'লো কৃষি সার এবং কৃষিকার্যে সহায়ক পশুর অভাব। তখন কৃষি সারের অভাবের জন্য অনেকটাই দায়ী ছিল গৃহপালিত পশু, যথা ঘোড়া এবং ভেড়ার অভাব। অন্যদিকে কৃষকেরা অনেক সময় নতুন নতুন পতিত জমিতে, যার অধিকাংশ ছিল অনুর্বর, ফসল উৎপাদন করার নীতি গ্রহণ করার ফলেও গবাদি পশু এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারের অভাব দেখা যায়। এর সহজবোধ্য কারণ হলো জমির পরিমাণ বাড়লেও গবাদি পশুর পরিমাণ সমানুপাতিক হারে বাড়ে নি।

একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যদিকে মন্থরগতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল ছিল খাদ্যে ঘাটতি। খাদ্যাভাব সমাজে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং ১৭৫০ সালের পর খাদ্য দাঙ্গা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৭৮৭-৮৮ সালে খাদ্যাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছিল; এর কারণ ছিল শস্যহানি ও অজন্মা। এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি ছিল অনিবার্য। কিন্তু পাল্লা দিয়ে মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়ায় সর্বত্র এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই ভয়াবহ অবস্থার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিপ্লবের সময়।

ফ্রান্সে কৃষি ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামীণজীবনে যৌথ অধিকার ও ভোগ সম্পর্কিত তীব্র এক ধরনের অনুভূতি। সমগ্র গ্রাম ছিল যেন এক বৃহৎ যৌথ পরিবার। এর একটা কারণ ক্ষেত খামার তদারকি করার জন্য একই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ও কৃষি ব্যবস্থা। প্রত্যক্ষ করের বোঝা সামগ্রিকভাবে একটি গ্রামের উপরই চাপানো হতো এবং প্রত্যেক গ্রামবাসী তা ভাগ করে নিত। সমস্ত অধিকার যৌথভাবে ভোগ করা হতো। সেগুলি রক্ষা করার জন্য যৌথভাবে তারা আদালতের শরণাপন্ন হতো। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা বসতো চার্চ প্রাঙ্গণে। গ্রামের জমিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হলেও উৎপাদিত ফসল সমগ্র গ্রামের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হতো। ফ্রান্সে কৃষকদের অবস্থা যে মোটেই ভাল ছিল না এবং সরকার, চার্চ ও অভিজাত সামন্তপ্রভু—সবাই তাদের করভারে বা অন্যান্য দাবী দাওয়া নিয়ে জর্জরিত করেছিল, সে কথা আমরা প্রসঙ্গান্তরে বলেছি। জিরন্দিন নেত্রী মাদাম রোলাঁ (Madam Roland) আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, ক্যারিবিয়ান ও গ্রীণল্যান্ডবাসী এস্কিমোদের চাইতেও ফরাসী কৃষকরা ছিল শতগুণ বেশি দুঃখী। অষ্টাদশ শতকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হ'য়েছিল। সি. ই. লাব্রুস্ (C. E. Labrousse) দেখিয়েছেন যে, অষ্টাদশ শতকে মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দরিদ্র লোকের খাদ্য যথা ভুট্টা, রাই, নিম্নমানের গম প্রভৃতির দাম ভালো গমের চেয়ে বেশি বেড়েছিল। তেন (Taine) গ্রামের গরীব মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন এমন একজন ব্যক্তির, যে কিনা একটি জলাশয়ে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য এদিক ওদিক হলেই তার মৃত্যু অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের জন সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ঐতিহাসিক কোবানের (cobban) কাছে রহস্যজনক বলে মনে হ'য়েছে। এই মরিয়া ও বেপরোয়া অবস্থা কৃষকদের বিদ্রোহ করতে ইন্ধন যুগিয়েছিল এবং কৃষক অভ্যুত্থান বিরল ঘটনা ছিল না।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স ছিল যথেষ্ট অগ্রণী। এ বিষয়ে তার স্থান ছিল ইংল্যাণ্ডের পরেই। চতুর্দশ লুই-এর আমলে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একটানা প্রায় ২৫ বছর ধরে শান্তি বিরাজ করায় ফ্রান্স আবার দ্রুতগতিতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রায় সমকক্ষ

Scanned with CamScanner

হ'য়ে উঠেছিল। আমেরিকা মহাদেশের কানাডায় প্রতি বছর ১৫টি করে জাহাজ বিভিন্ন বন্দরে ভিড়তো। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। প্রতি বছর আফ্রিকার দাস ব্যবসায়ে অংশ নিত ৪০০ থেকে ৫০০ বাণিজ্যিক তরী। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে অবশ্য ফরাসীরা ইংরেজদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। আটলান্টিক মহাসাগর ছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যেও ফরাসী বণিকরা অংশ গ্রহণ করতো। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের সামুদ্রিক বন্দরগুলি সব সময়েই কর্মব্যস্ত থাকতো। সেন্ট মালো (Saint Malo) ছিল মাছের ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র; মুক্ত বন্দর মার্সাই (Marseille) দিয়ে চলতো পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসা; লা হাভরে (La Havre) বন্দর ছিল আটলান্টিক মহাসাগরীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, আর একটি মুক্ত বন্দর ডানকার্ক-এর (Dunkirk)সঙ্গে ছিল বাল্টিক (Baltic) সাগরের বাণিজ্য সম্পর্ক। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে প্রধান ছিল লা রচেল (La Rochelle), নান্টোস (Nantes) ইত্যাদি। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন বন্দর ছিল বোর্দো (Bordeaux)। এই বন্দরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। ১৭২৪ সাল থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে এই বন্দরে ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ছয় গুণ বেড়েছিল। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ পর্যটক আর্থার ইয়ং (Arthur Young) যখন ফ্রান্সে আসেন, তখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, অবশ্যই কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যে বোর্দোর সঙ্গে লিভারপুলের (Liverpool) কোন তুলনাই হয় না। ১৭১৫ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে ফ্রান্সে বহিঃবাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিপ্লবের আগেই ফ্রান্স ভারত ও আমেরিকা মহাদেশে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে তখনও তার বিশিষ্ট একটি স্থান ছিল।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য উন্নতির ধারা খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না যদিও ১৭৫০ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণও প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে উন্নতির আরও অবকাশ ছিল। কিন্তু ফরাসী সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশের পথে সব চেয়ে বড় বাধা ছিল শুল্ক বেড়া। ফ্রান্সের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কোন জিনিস পাঠাতে হলে চড়া হারে শুল্ক দিতে হতো। সারা অষ্টাদশ শতক জুড়ে অনেকেই গোটা ফ্রান্সকে একটি শুল্ক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী পরোক্ষ কর আদায়কারী কর্মচারীরা (ফারমার্স জেনারেল) এই সব প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছিল। তখনকার সরকার মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাস করতো। তাই জনগণের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে এবং নানা কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করে উচ্চাকাঙ্খী বুর্জোয়া শ্রেণীর সমালোচনার বিষয়বস্তু হতো। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় ফ্রান্সের একটি বড় এলাকায় বিদেশী বণিকরা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ সুবিধা পেত, দেশী বণিকরা তা পেত না। অথচ ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ ছিল। ফ্রান্সের রাস্তা ঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট উন্নত। এর জন্য জোরজবস্তি শ্রম বা কর্ভি (Corvee) আদায় করা হতো। রাস্তাগুলি ছিল যথেষ্ট চওড়া এবং সোজা। আর্থার ইয়ং ফ্রান্সের রাস্তা ঘাটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং সেখানে যানবাহনের স্বল্পতা দেখে দুঃখ করেছেন। আসলে বাণিজ্যের প্রয়োজনে নয়, রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হ'য়েছিল সামরিক স্বার্থে।

অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লব না হলেও ফ্রান্স তখন শিল্পে যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং ইংল্যাণ্ডের পরেই ছিল তার স্থান। ১৭৫০ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে ফ্রান্সে শিল্প উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফ্রান্সে কর্মব্যস্ত বন্দরগুলির সমৃদ্ধি অনেকাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং প্রায়ই বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পে নিয়োগ করা হতো। বেশ কিছু শিল্প প্রয়াস, বিশেষতঃ চিনি, বন্দরগুলিকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। ষোড়শ শতকেই লিঁয় (Lyon) শহরের রেশম শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদকগণ কাঁচা রেশম আমদানি করে তা থেকে তৈরী করা কাপড় বিদেশে রপ্তানি করতো। বোর্দো বন্দরে মদ, চিনি ও জাহাজ মেরামতি কারখানা ছিল। ফ্ল্যাণ্ডার্স (Flanders) লিনেন বস্ত্র, পশম ও সুতীবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। মেন (Maine), ব্রিটানি (Britanny) ও ক্যাম্ব্রেসিসেও (Cambresis) লিনেন বস্ত্র তৈরী হতো। বস্ত্র শিল্পেও ফ্রান্স যথেষ্ট উন্নত ছিল। ফ্রান্সের রাজারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিলাস সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া যুদ্ধে ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী যথা— কামান, গোলা, বারুদ, অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি তৈরীর জন্যও কারখানা ছিল। ধাতু শিল্পের মধ্যে কয়লা ও লোহার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের বৃহত্তম খনি শহর আন্‌জিনে (Anzin)প্রায় ৪০০০ শ্রমিক কাজ করতো।

ফ্রান্স শিল্পে যথেষ্ট উন্নত হলেও এবং শিল্পোৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহার করা হলেও সেগুলি ছিল ব্যতিক্রম মাত্র। ফ্রান্সেও অবশ্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রবণতা ছিল এবং যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হ'য়েছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের তুলনায় তা অনেক কম ছিল। যেমন ১৭৮৯ সালে ইংল্যাণ্ডে ২০,০০০জেনি নির্মিত তাঁত যন্ত্র ব্যবহার করা হলেও ফ্রান্সে তার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০টি। অধিকাংশ শহরেই শিল্প উৎপাদন পরিচালিত হতো শিল্পসঙ্ঘের মাধ্যমে। তবে অনেক সময়ই ধনী ব্যবসাদারেরা নিজেরাই মিস্ত্রি বা কর্মচারীদের মাধ্যমে উৎপাদন করতো। লিয়ঁর (Lyon) রেশম শিল্পে এই প্রবণতা সুস্পষ্ট ছিল। এখানে মালিক-শ্রমিক সংঘাত অস্বাভাবিক ছিল না। ১৭৪৪ ও ১৭৮৬ সালে এখানে ধর্মঘট ও অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৭৮৬ সালে মিস্ত্রি ও মজুরদের অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সেনাবাহিনী তলব করতে হ'য়েছিল। ব্যবসাদার উৎপাদক শ্রেণী শিল্পসঙ্ঘের অবলুপ্তির পক্ষপাতি ছিল। তুর্গো (Turgot) এই প্রথা তুলে দিলেও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময় তা আবার চালু করা হয়। এদিকে মালিক ও কারিগরদের মধ্যে কোন কারণে বিরোধ বাঁধলে সরকার মালিকের পক্ষই নিত। আমরা আগেই দেখেছি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক-কারিগরদের বেতন কখনই সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় নি। তারা অবশ্য মজুরি বৃদ্ধির চেয়েও বেশি জোর দিত খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের উপর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তখন পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ সুস্পষ্ট কোন রূপ নেয় নি।

ফ্রান্সে শিল্পোন্নয়ন প্রয়াস ব্যাহত হবার আর একটি কারণ হলো পুঁজির অভাব। ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পে পুঁজির নিয়োগ বা লগ্নী অবশ্যই কিছুটা হ'য়েছিল। কিন্তু বড় শিল্প পুঁজির জন্য সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। সাবান ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী সরকারী কারখানাতেই প্রস্তুত হতো। তাছাড়া অনেক

Scanned with CamScanner

সময় এর জন্য সরকারী ঋণ, ভরতুকি, এমন কি একচেটিয়া অধিকারও অনেক উৎপাদককে দেয়া হতো। এই রকম একজন ভাগ্যবান ভাগ্যান্বেষী উৎপাদক হলেন জন হোলকার (John Holker) যিনি ইংল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে এসে রুয়ে (Rouen) শহরের সন্নিকটে একটি কাপড়ের কারখানা স্থাপিত করেন। এরপর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য ভেলভেট ও অন্যান্য সূতী বস্ত্র তৈরী করার সুযোগ পান এবং শেষপর্যন্ত এক উচ্চ সরকারী পদ লাভ করেন। সরকারী ঋণ ছাড়া পুঁজির আর কোন উৎস ছিল না। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বা স্টক এক্সচেঞ্জ—এ সব কিছুই ছিল না। এক কথায় শিল্পোন্নয়নের কোন উন্নত পরিকাঠামো ফ্রান্সে ছিল না।

সামগ্রিকভাবে বলতে পারি ফ্রান্সের অর্থনীতি স্থিতিশীল হলেও অনুন্নত ছিল না। সম্পদের মানদণ্ডে বরং আমরা ফ্রান্সকে ধনী দেশই বলতে পারি, অন্ততঃ অষ্টাদশ শতকের মাপকাঠিতে। ফ্রান্সে ধনী অভিজাত সম্প্রদায় ও বুর্জোয়ারা সুখে সাচ্ছন্দ্যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতো। এ কথা সত্য যে, সমকালীন যুগের রক্ষণশীল মার্কেন্টাইল (Mercantile) মতবাদ— যার মূলকথা হলো আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, নেভিগেশন আইন, ঔপনিবেশিকতা, রাষ্ট্রীয় কারখানা স্থাপন ও একচেটিয়া অধিকার প্রদান এবং জনগণের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের উপর কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ— ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল এবং তার জন্য ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণী সরকারের উপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। ফ্রান্সে অবশ্য এই মতবাদ সর্বদা কঠোরভাবে পালিত হতো না এবং তার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক ছিল। যাই হোক এ সত্ত্বেও ফ্রান্সের মূলধনী উচ্চ বুর্জোয়ারা যথেষ্ট সম্পদ ও বিত্তের অধিকারী ছিল। প্যারিস সহ ফ্রান্সের শহরগুলি ছিল ক্রম বর্ধমান সম্পদ ও বিত্তের জ্বলন্ত উদাহরণ। বস্তুতঃ ফ্রান্সে গৃহ নির্মাণ শিল্পের কত উন্নতি হ'য়েছিল, তার প্রমাণ শহরগুলির অট্টালিকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। ধনী লোকেরা শহরে এসে ভিড় করছিল এবং তার ফলে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্যারিসের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। লিয়ঁ, মার্সাই, বোর্দো শহরগুলির লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষের কাছাকাছি। কিন্তু ফ্রান্স দরিদ্র দেশ না হলেও, তা ছিল দরিদ্রদের দেশ। অষ্টাদশ শতকের শেষে শহরগুলির মোট জনসংখ্যা কখনই ২½ মিলিয়নের বেশি ছিল না। এর মধ্যেও গরীব লোক তথা সাঁ কুলোৎদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গ্রামে বাস করতো ২২ থেকে ২৪ মিলিয়ন মানুষ। আর গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে অসম ধন বণ্টনই ছিল অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের অর্থনীতির সব চেয়ে বড় সমস্যা। ফ্রান্সের রাজ পরিবারের বিলাসবহুল জীবন ছিল প্রবাদ বাক্যতুল্য। তাছাড়া সংখ্যালঘু অভিজাত ও বুর্জোয়ারা ছিল বিপুল বিত্তশালী। কিন্তু শ্রমিক কৃষকদের দারিদ্র ছিল নগ্নভাবে প্রকট। গ্রাম শহরে ভবঘুরে ও ভিখারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল এবং তা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, তা এক সামাজিক সমস্যায় পরিণত হ'য়েছিল। কিন্তু গরীব মানুষকেই বইতে হতো সব চেয়ে বেশি করের বোঝা। অর্থাৎ ফ্রান্সে প্রাচুর্য ও দারিদ্রের সহাবস্থান ঘটেছিল।

দারিদ্র বিপ্লবের পটভূমি তৈরী করে, কিন্তু দারিদ্র বিপ্লব ঘটাতে পারে না। সমাজে সবাই দরিদ্র হলে বিপ্লব হয় না। তবে ধনবৈষম্য যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের

জন্ম দেয়, তা বিপ্লবের ক্ষেত্র উর্বর করে। দরিদ্র মানুষের চাহিদা কম। তাদের জীবনযাত্রার মান নিচু। দু-মুঠো ভাত আর পরনের ন্যূনতম পোষাক পেলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। সামাজিক মান মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। অন্ন বস্ত্রের দাবীতে তারা দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে পারে; কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের কথা চিন্তা করে না। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের দরিদ্র মানুষও বিপ্লবের জন্য তৈরী ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল এবং তারা তার প্রতিকারও চেয়েছিল। একমাত্র কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমেই ফ্রান্সের সব সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার করা সম্ভব ছিল। তাছাড়া ফ্রান্সের কর ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। দুঃখের বিষয় অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের রাজা এ সব সংস্কার সম্পর্কে অনেকাংশে উদাসীন ছিলেন।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঃ রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সঙ্কট

এবার আমরা আসি সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, অর্থাৎ ফরাসী সরকারের জটিল অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিশ্লেষণে, যার সমাধান আমাদের উপরে বর্ণিত ফ্রান্সের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সম্ভবপর হয় নি। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং তা সমাধানে ব্যর্থতাই বিপ্লব অনিবার্য করে তুলেছিল। সমাজে একটা বড় অংশের ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলেই বিপ্লব হয় না। এই অবস্থা তো গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়েই ছিল। তাহলে ১৭৮৯ সালেই কেন বিপ্লব ঘটলো এর উত্তর খুঁজতে হবে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যে। গভীর নিম্নচাপ না হ'লে যেমন ঝড় ওঠে না, তেমনি বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব হয় না।

প্রশ্ন হলো— কি ছিল এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বা ফরাসী রাজতন্ত্রের গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রকৃতি? এক কথায় এর উত্তর হলো— অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্সের রাজা দেউলিয়া হবার মুখ এসে দাঁড়িয়েছিলেন; কিছুতেই তিনি সরকারী আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখতে পারছিলেন না। বেশ কিছু দিন ধরেই আয়ের চেয়ে ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে চলেছিল। এই অবস্থায় সরকার ঋণ গ্রহণ করে অতিরিক্ত ব্যয়ভার মেটাতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ঋণ করলে সুদের টাকা গুণতে হয়। সুতরাং এ পথে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। অবস্থা কতটা ভয়াবহ হ'য়েছিল তা বোঝার জন্য পরিসংখ্যার আশ্রয় নেয়া যাক। ১৭৮১ সালে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৬,০০০,০০০ লিভ্র। সরকারের ঋণের বহর কতটা ছিল তা বুঝতে গেলেও পরিসংখ্যার দিকে নজর দিতে হবে। ১৭৮৮ সালে ফরাসী সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৩০,০০০,০০০ লিভ্র। এর মধ্যে সরকারী ঋণ বাবদ সুদের অঙ্ক ছিল ৩১৮,০০০,০০০ লিভ্র।

সরকার চালাতে গেলে টাকা খরচ করতেই হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে বিপুল ও অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির কি কারণ ছিল? আসলে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে ব্যয়ের চেয়ে অপব্যয়ই হ'য়েছে বেশি। প্রথমতঃ ধরা যাক অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ মানেই বিপুল অর্থব্যয়। কিন্তু প্রয়োজনে দেশের স্বার্থে যুদ্ধ করতেই হয়। সেটা কিছু অন্যায় কাজ নয়। কিন্তু অষ্টাদশ

Scanned with CamScanner

শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্স যে সব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাতে তার লাভের চেয়ে ক্ষতিই হ'য়েছে বেশি। এই সময় ফ্রান্স দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল— অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮) ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। ফ্রান্স দুটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিল। একটি ইউরোপে স্থলযুদ্ধ; প্রথমে অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে এবং পরে অর্থাৎ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়ে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন ছিল ইউরোপের বাইরে ভারত ও আমেরিকা মহাদেশে। এই দুটি অঞ্চলে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ছিল বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ যুদ্ধ ছিল নৌ-যুদ্ধ। ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ফ্রান্সের অংশ গ্রহণের বাস্তব কোন কারণ ছিল না। তার মূল স্বার্থ ছিল ভারত ও আমেরিকায় এবং তার উচিত ছিল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। কিন্তু ফ্রান্সের নীতি ছিল বিপরীত। সে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধের গুরুত্ব উপেক্ষা করে অনাবশ্যক ইউরোপের স্থলযুদ্ধ নিয়ে মাতামাতি করেছিল। ইউরোপীয় যুদ্ধে অংশ নিয়ে ফ্রান্সের কোন লাভ হয় নি। তার রাজ্যসীমা সামান্যতম বৃদ্ধি পায় নি। অবশ্য সে রকম কোন আশা নিয়ে ফ্রান্স যুদ্ধ করেও নি। কিন্তু আমেরিকা ও ভারত দু-জায়গাতেই তার বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়। ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক ও নৌ-শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাবে ফ্রান্স নিজেই তার সর্বনাশ করে। এই দুটি যুদ্ধেই ফ্রান্সের বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু লাভের ঘর ছিল শূন্য। ফ্রান্সের অর্থনীতি এই চাপ সহ্য করতে পারে নি। এই ভাবে দেউলিয়ার পথ খুলে যায়। দুটি যুদ্ধই হ'য়েছিল পঞ্চদশ লুই (Louis xv) এর আমলে। ১৭৭৪ সালে যখন ষোড়শ লুই (Louis xvi) সিংহাসনে বসেন, তখন মন্ত্রী তুর্গো (Turgot) তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, এর পর যুদ্ধ হ'লে সর্বনাশ অনিবার্য। ষোড়শ লুই তাঁর কথা শোনেন নি। ১৭৭৮ সালে ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধেও অংশ নেয়। এতেও একমাত্র ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করা ছাড়া ফ্রান্সের অন্য কোন স্বার্থ ছিল না। ইংল্যাণ্ড জব্দ হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়। আর ফ্রান্সের খরচ হয় ১,৮০০,০০০,০০০ থেকে ২,০০০,০০০,০০০ লিভ্র। এই বিপুল ব্যয় ফ্রান্সের ম্রিয়মান অর্থনীতির মৃত্যুলগ্ন সমাসন্ন করে। যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে সরকারকে প্রচুর টাকা ধার করতে হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে কব্যান লিখেছেন— "No one as yet supposed that the price to be paid for American independence was a French revolution." বস্তুতঃ এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ফলে ফরাসী অর্থনীতি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল যে তার থেকে ফ্রান্স মুক্ত হতে পারে নি। যাই হোক ১৭৩৩ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে যে চারটি যুদ্ধে ফ্রান্স অংশ গ্রহণ করেছিল, তাতে তার প্রায় ৪,০০০,০০০,০০০ লিভ্র খরচ হ'য়েছিল।

অনর্থক, অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের আর একটি উদাহরণ হলো রাজ পরিবারের অপরিমিত বিলাস ব্যসন। এই খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হতো, তার সবটাই জলে যেত, কেননা এর বিনিময়ে কোন অর্থ উপার্জিত হতো না। পঞ্চদশ লুই শিকার ও নারীসঙ্গ ভালবাসতেন। তাঁর মহিষী মাদাম দ্য পম্পাদোর (Pompadour) ছিলেন প্যারিসের ৫০০ টি নামকরা স্বর্ণকার ও দক্ষ কারিগরের নিয়মিত খরিদ্দার। এর মধ্যে

একটি বিখ্যাত দোকানে, ১৭৪৮ থেকে ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত যারা হিসাব নিকাশের খাতা পাওয়া গেছে, তিনি প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার হাজিরা দিতেন। ষোড়শ লুই-এর স্ত্রী মারী আঁতোয়ানেত (Marie-Antoinette) ছিলেন আভিজাত্য ও বিলাসের প্রতীক। তাঁর বিলাস উপকরণের বর্ণনা দিতে শুরু করলে তা শেষ করা দুরূহ। রাজ পরিবারে পোষ্যের সংখ্যা ছিল অগুণতি— প্রায় ১৫,০০০ জন। রাষ্ট্রের মোট আয়ের এক দশমাংশ ব্যয়িত হতো এদের ভরণ পোষণে।

ফরাসী রাজতন্ত্রের ব্যয়বৃদ্ধির তৃতীয় কারণটি হলো প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি। এই খাতে বাড়তি খরচকে অবশ্য অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বলা যুক্তিযুক্ত নয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে এই ব্যয়বৃদ্ধি অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া জনকল্যাণকর কিছু কাজে, যেমন রাস্তাঘাটের উন্নতি, ব্যয়বৃদ্ধি নিন্দনীয় ছিল না। স্বাস্থ্য, জনসেবা প্রভৃতি খাতে অর্থব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে এই সব দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতো। তবে এ ক্ষেত্রেও অপব্যয় যে একেবারেই হতো না, তা বলা চলে না। রাজসভায় বহু কর্মচারী সারা বছরে মাত্র তিন মাস কাজ করতো। কিন্তু তারা বেতন পেত পুরো বছরের।

অর্থনৈতিক সঙ্কট যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকলে সর্বনাশ অনিবার্য ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই মারাত্মক অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার কোন পথই কি খোলা ছিল না? পথ হয়ত খোলা ছিল; কিন্তু সে পথ ছিল দুর্গম। যে কোন পরিস্থিতিতে আয় ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনার জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে— প্রথম ব্যয় সংক্ষেপ ও দ্বিতীয় আয় বৃদ্ধি। ফ্রান্সের সরকার প্রথম পথ গ্রহণ করে নি। একটু আগেই বলেছি ফ্রান্স ব্যয়ের চেয়ে অপব্যয়ই করেছে বেশি। অনাবশ্যক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকট কখনই এত তীব্র আকার ধারণ করতো না। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের অপরিমিত অর্থব্যয়ের ফলে যখন ফরাসী অর্থনীতি বিপর্যস্ত, তখন কোন যুক্তিতে ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, তা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। এক্ষেত্রে তুর্গোর পরামর্শ অগ্রাহ্য করা অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে রাজ পরিবারের বিলাসবহুল জীবনেরও কোন যুক্তি ছিল না। এর পর অবশ্য ফ্রান্স কোন যুদ্ধে অংশ নেয় নি। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার, তা হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং ব্যয় সংকোচের প্রশ্ন তখন অবান্তর হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের পক্ষে আয়বৃদ্ধির সুযোগ ছিল, কারণ একটু আগেই আমরা দেখেছি যে, ফ্রান্স দরিদ্র দেশ ছিল না। ফ্রান্সে বিত্তশালী লোকের অভাব ছিল না। আসলে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে হ'লে যে কাজ সবচেয়ে বেশি জরুরী ছিল, তা হ'ল ফ্রান্সের ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। দরিদ্র মানুষের উপর নতুন ক'রে কর বসানোর কোন সুযোগ ছিল না। কর ভারে তারা ছিল বিপর্যস্ত। বাড়তি কর দেবার কোন সামর্থই তাদের ছিল না। সুতরাং কর চাপাতে হলে যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর উপরই তা চাপানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রচলিত কর ব্যবস্থায় তাদের অনেক ছাড় ছিল। যাজক সম্প্রদায় তো কোন করই দিত না। অথচ কর দেবার সামর্থ তাদের ছিল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হলে পুরাতনতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর রদবদল ছিল অপরিহার্য।

এবার কথা হলো অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কর বসাতে রাজা ইচ্ছুক ছিলেন কি না এবং কর প্রদানে অভিজাত সম্প্রদায়কে বাধ্য করার মত দৃঢ়তা ও মানসিকতা

Scanned with CamScanner

তাঁর ছিল কিনা। অবশ্য অভিজাত সম্প্রদায় যদি স্বেচ্ছায় কর প্রস্তাব মেনে নিত, বা রাজার সঙ্গে সহযোগিতা করতো, তাহ'লে কর প্রদানে তাদের বাধ্য করার কোন প্রশ্নই উঠতো না। একটু পরে ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখব ষোড়শ লুই-এর সুযোগ্য মন্ত্রীরা— তুর্গো (Turgot), নেকার (Necker), ক্যালো (Calonne) ও ব্রিয়া (Brienne)— অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য রাজাকে কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাঁদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়েছিল। অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং রাজাও তাদের বিরোধিতার চাপে নতি স্বীকার ক'রেছিলেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায় কর প্রদানে আপত্তি করল কেন? সামান্য কিছু অতিরিক্ত কর দেয়া ছিল তাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এর ফলে তাদের গায়ে সামান্যতম আঁচড় পড়তো না। আসলে করের পরিমাণ নয়, তাদের আপত্তি ছিল কর দিতেই, কারণ— কর প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থই ছিল তাদের বিশেষ সুবিধার উপর আক্রমণ। আর সুবিধায় সামান্য ফাটল পড়লেই তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আস্তে আস্তে মুছে যাবার আশঙ্কা ছিল। এটা অভিজাতদের পক্ষে মেনে নেয়া কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য তারা বুঝেছিল যে, সামান্য এই স্বার্থত্যাগ করলে আখেরে তাদের ভালই হতো। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে। যাই হোক কর প্রস্তাবের অর্থ শুধু পুরাতন কর ব্যবস্থার পরিবর্তনই নয়, এর ফলে প্রাক্ বিপ্লব যুগে ফ্রান্সের যে সমাজ বিশেষ বিশেষ সুবিধার উপর দাঁড়িয়েছিল, তার উপর আক্রমণ এবং তারও পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। অর্থাৎ কর প্রস্তাবের মধ্যেই একটা নিঃশব্দ বিপ্লবের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। তাই অভিজাত সম্প্রদায় কর প্রস্তাব মানতে রাজী হয় নি।

কিন্তু রাজা কি পারতেন না তাদের কর দিতে বাধ্য করতে? রাজা হয়ত তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সে ধরণের কোন সদিচ্ছা বা তার চেয়েও বড় কথা সাহস ও ক্ষমতা ছিল না। ষোড়শ লুই-এর মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতের পুতুল। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কাছে তিনি এক প্রকার নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন দক্ষ ও যোগ্য। তিনি যদি তাঁদের সক্রিয় সমর্থন জানাতেন, তাহ'লে তাঁরা হয়ত তাঁদের সংস্কারগুলি কার্যকরী করতে পারতেন। কিন্তু রাজা তাঁদের সমর্থন করার পরিবর্তে পদচ্যুত করেন এবং এইভাবেই তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছিল। পালার্ম কর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু সাংবিধানিক পথেও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর ছিল না। সংবিধান অনুযায়ী কর ধার্য করার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল স্টেটস্ জেনারেল। কিন্তু সেখানকার ভোটদান পদ্ধতি এমন বিচিত্র ছিল যে, সেখানে কর প্রস্তাবগুলি কখনই গৃহীত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ সুবিধাবাদী দুই সম্প্রদায় কখনই কর প্রস্তাব সমর্থন করতো না। বস্তুতঃ এই কারণেই অভিজাত সম্প্রদায় কর প্রস্তাব পুরোপুরি নাকচ করে নি। তারা স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন ডাকার জন্যই দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু স্টেটস্ জেনারেলের ভোটদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে যদি প্রত্যেক এস্টেটের একটি করে ভোটের বদলে প্রত্যেক সদস্যের মাথা পিছু ভোটাধিকার দেওয়া হতো একমাত্র তাহ'লেই অভিজাত সম্প্রদায়কে কর দানে বাধ্য করা যেতে পারতো। তবে তা করতে গেলে ফ্রান্সের সাংবিধানিক কাঠামো আগের মত থাকতো না। কাজেই দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে

Scanned with CamScanner

হলে শুধু ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর রদবদল করলেই চলতো না, সাংবিধানিক কাঠামোরও পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। আর এই সব মৌলিক পরিবর্তন মানেই তো বিপ্লব। এই সব পরিবর্তন মানতে চায় নি বলেই অভিজাত সম্প্রদায় মন্ত্রীদের প্রস্তাবগুলি বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদের দাবীর কাছে রাজা মাথা নত করেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, তার সমাধান না করলে সর্বনাশ অনিবার্য ছিল। সুতরাং ফ্রান্সে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছিল। সাংবিধানিক পথে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে যখন এ সমস্যার সমাধান হলো না, তখনই বিপ্লব অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। কাজেই দেখা যাচ্ছে এক মাত্র রাজা বা অভিজাত সম্প্রদায়ই পারতো বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এড়াতে। রাজা যদি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করতে পারতেন এবং সেই সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায় যদি সামান্যতম ত্যাগ স্বীকারে রাজী হতো, তা'হলে অর্থনৈতিক সংকট অনেকটা কেটে যেত এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দুর্বল হয়ে যেত। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয় নি বলেই বিপ্লব এড়ানো সম্ভব হয় নি।

Scanned with CamScanner